প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের ভিত্তিতে সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ
Development of Society and Civilization based on Archaelogical Relics

ইউনিট ৩

প্রত্নতত্ত্ব মানুষের অতীত কর্মকাণ্ডের অধ্যয়ন। প্রাগৈতিহাসিক সময়ের বস্তুগত ও অবস্তুগত সহস্কৃতি সম্পর্কে প্রত্নতত্ত্ব আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট ধারণা দেয়। প্রত্নতত্ত্ব প্রাচীনকালের মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি, স্থাপত্য, জীবন-যাপনের কৃৎকৌশল, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের উপকরণ ও জৈবিক উপাদানসমূহ (ফসিল) অধ্যয়ন করে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির নানা দিক সম্পর্কে জানতে প্রত্নতত্ত্বের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষের প্রাগৈতিহাসিক সংস্কৃতি ও সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে জ্ঞানের যে শাখা সৃষ্টি হয়েছে তাকে প্রত্নতত্ত্ব বলে। প্রত্নতাত্ত্বিকরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে শত শত বা হাজার হাজার বছর আগের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও মানুষের নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য, যুদ্ধাস্ত্র, কৃষি ও সেচ যন্ত্রপাতি মাটি খুঁড়ে বের করেন। প্রাচীন সভ্যতার সময় নির্ধারণ, সাংস্কৃতিক ও প্রতিবেশিক পরিস্থিতি যাচাইয়ে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের গুরুত্ব অনেক বেশি। প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণের জন্য রেডিও কার্বন ডেটিং পদ্ধতি ও রেডিও একটিভ পটাশিয়াম পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এসব পদ্ধতির মাধ্যমে জীবাশ্ম বা প্রত্নসম্পদের বয়স বা প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৭ দিন**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ- ৩.১ প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং এর উৎসসমূহ
পাঠ- ৩.২ প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ এবং প্রাচীন, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৩.৩ তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ- ৩.৪ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ : ময়নামতি
পাঠ- ৩.৫ পাহাড়পুর
পাঠ- ৩.৬ মহাস্থানগড়
পাঠ- ৩.৭ উয়ারি-বটেশ্বর

পাঠ-৩.১ প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা এবং এর উৎসসমূহ
Definition of Archaeology and Its Sources

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রত্নতত্ত্ব, এরিয়াল জরিপ, রিমোট সেন্সিং, জরিপ পদ্ধতি।

খনন কাজের মাধ্যমে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাচীন সভ্যতার বিভিন্ন উপাদান উদ্ধার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব (Archaeology)। Archaeology শব্দটি গ্রিক Archaeos এবং Logia শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হচ্ছে প্রাচীন অধ্যয়ন। প্রাচীন সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস অনুসন্ধানে প্রত্নতত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রত্নতত্ত্বের সবচেয়ে বড় সুবিধা হচ্ছে, লিখিত উপাদান ছাড়াও কেবল ব্যবহার্য সামগ্রী বা অলিখিত উপাদান থেকে ধ্বংস হয়ে যাওয়া সভ্যতার নানা বৈশিষ্ট্য উদঘাটন করা যায়। উইলিয়াম কার্নিংটনকে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজের মূল উদ্যোক্তা হিসেবে মনে করা হয়।

অক্সফোর্ড লিভিং ডিকশনারি অনুসারে, খনন কাজের মাধ্যমে ইতিহাস ও প্রাক-ইতিহাসকে অধ্যয়ন করা এবং সময়ের সাথে সাথে টিকে থাকা বিভিন্ন দ্রব্য ও অস্তিত্বশীল বস্তুর বিশ্লেষণকে প্রত্নতত্ত্ব বলা হয়। সোসাইটি ফর আমেরিকান আর্কিওলজির মতে, প্রত্নতত্ত্ব হচ্ছে প্রাচীন মানব ইতিহাসের টিকে থাকা উপাদানসমূহের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান। নৃবিজ্ঞানী হোবেল (Hoebel) তাঁর *Anthropology: The Study of Man* গ্রন্থে বলেছেন, প্রত্নতত্ত্ব আদিম মানুষের পরিত্যক্ত দ্রব্যসামগ্রী এবং তাদের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদসহ বস্তুগত সংস্কৃতির যেসব দিক এখনো উদ্ধার হয়নি সেগুলো উদ্ধারে সচেষ্ট।

ব্রিটিশ নৃবিজ্ঞানী ই.বি. টেইলর বলেন, প্রত্নতত্ত্ব অতীতের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন (Archaeology is the study of remains of the past)। নৃবিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে প্রত্নতত্ত্বের অধ্যয়ন শুরু হলেও এটি এখন স্বতন্ত্র শাস্ত্র (Discipline) হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। বিকাশমান এ শাস্ত্রটির অনেকগুলো শাখা রয়েছে। যেমন, প্রাগৈতিকহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব, পরিবেশ প্রত্নতত্ত্ব, প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যা, জলগর্ভস্থ প্রত্নতত্ত্ব, জাদুঘর অধ্যয়ন, ঐতিহ্য ব্যবস্থাপনা, নগর ব্যবস্থাপনা, লোকপ্রত্নতত্ত্ব ইত্যাদি।

প্রাচীন কোনো নির্দশন উদঘাটনের লক্ষ্যে খনন কাজ পরিচালনা করার আগে ভৌগোলিক এলাকা সনাক্তকরণের জন্য রিমোট সেন্সিং ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও মাঠ জরিপ পদ্ধতি, এরিয়াল জরিপ, ভৌগোলিক জরিপ পদ্ধতিও ব্যবহৃত হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য খনন কাজকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের বয়স কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে নির্ধারণ করা হয়।

প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহ (Sources of Archaeology)

প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তি হচ্ছে নিয়মতান্ত্রিক খনন কার্যক্রম। খননকাজের মাধ্যমে অতীত-ইতিহাস উন্মোচিত হয়। খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত হাড়, মাথার খুলি, ব্যবহার্য সামগ্রী, অস্ত্র, যন্ত্রপাতি, তৈজসপত্র, আসবাবপত্র ইত্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রাচীন যুগের মানব সমাজ ও তাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে কার্যকর ধারণা পাওয়া যায়। বহুবিধ উৎস থেকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদঘাটন করা যায়। যেমন:

১) লিখিত উৎস: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাহিত্য, দলিল-দস্তাবেজ, লিপি প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে বিবেচিত। এসব থেকে প্রাচীন সমাজ ও সভ্যতার সময়কাল, শাসকবর্গ, তাদের শাসনকার্য, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে কার্যকর ধারণা লাভ করা যায়।

২) মৌখিক উৎস: প্রাচীন লোককথা, গল্প, কেচ্ছা-কাহিনী, রূপকথা ইত্যাদি প্রত্নতত্ত্বের মৌখিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত। যুগ যুগ কিংবা বংশ পরম্পরায় এসব মৌখিক উৎস সমাজে চলমান থাকে। সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠদের নিকট থেকে এগুলো পরবর্তী প্রজন্মে হস্তান্তরিত হয়।

৩) রাজপ্রাসাদ ও মন্দির বা ধর্মশালা: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত নগরীর রাজপ্রাসাদ, মন্দির বা ধর্মশালা প্রত্নতত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উৎস। এর মাধ্যমে প্রাচীন সমাজের নির্মাণ কৌশল, রুচিবোধ এবং ধর্মবোধের নিদর্শন স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

৪) শিলালিপি, চিত্রলিপি গুহাচিত্র: প্রাচীন যুগে কাগজ ছিলো না। মানুষ তার মনের কথা, প্রয়োজনীয় বার্তা, তথ্যাবলী, নির্দেশ, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি পাথর, পর্বতগাত্র, তামারপাত্র ইত্যাদিতে বিশেষ লিপির মাধ্যমে লিখে রাখত। বিশেষ করে রাজ্য শাসন প্রণালী সম্পর্কীয় বিষয়াবলি লিপির মাধ্যমে কঠিন পর্বতগাত্রে খোদাই করে রাখা হতো।এগুলো থেকে রাজ্য শাসনের কাল, রাজ্যের বিস্তৃতি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হতে পারেন।

৫) মুদ্রা, দেবদেবীর মূর্তি: মুদ্রার মাধ্যমে বিভিন্ন রাজার রাজত্বকাল, শাসকদের নাম ইত্যাদি সম্পর্কে জানা যায়। দেবদেবীর মূর্তি থেকে মানুষের জীবনের ধর্মীয় চিন্তাধারায় এবং শিল্পে নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলো থেকে মানুষের ক্রমবিবর্তনের ধারা এবং সাধারণ মানুষের জীবন দর্শনও উপলব্ধি করা যায়।

৬) আসবাবপত্র ও হাতিয়ার: আসবাবপত্র ও হাতিয়ার দেখে যুগকে চিহ্নিত করা যায়। যেমন– প্রস্তর যুগ, লৌহ যুগ, তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ইত্যাদি। সে যুগের মানুষ যে অস্ত্র ব্যবহার করতো তা নির্মিত হতো এসব ধাতুর মাধ্যমে। বিভিন্ন সময়ের আসবাবপত্র ও হাতিয়ার দেখে মানব সমাজের পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

৭) স্মৃতিফলক: প্রত্নতত্ত্বের উৎস হিসেবে স্মৃতিফলকের গুরুত্ব আছে। স্মৃতিফলক দেখে অতীত জীবনধারা সম্পর্কে জানতে পারা যায়। আর.এল ব্রাইন স্মৃতিফলকের গুরুত্ব স্বীকার করেছেন। তার মতে, "স্মৃতিফলক জীবনধারার সাক্ষী, সমাজচিত্রের দর্পন এবং মানুষের পেশা ধারণার অবলম্বন।"

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রত্নতত্ত্বের উৎসসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

প্রাচীন বা প্রাগৈতিহাসিক কালের প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবাশ্ম ও মানুষের ব্যবহার্য সামগ্রী, যুদ্ধাস্ত্র, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মাটি খুঁড়ে বের করে সে সম্পর্কে অধ্যয়ন করা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব। নৃবিজ্ঞান প্রত্নতত্ত্বকে এর অন্যতম শাখা হিসেবে অধ্যয়ন করে। তবে প্রত্নতত্ত্ব এখন স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত। খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত লিখিত, অলিখিত বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত উপাদান এ শাস্ত্রকে সমৃদ্ধ ও বিকশিত করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্নতত্ত্বের শাব্দিক অর্থ কী?
- ক) প্রাচীন অধ্যয়ন
- খ) মানুষের বিজ্ঞান
- গ) সামাজিক গবেষণা
- ঘ) কোনটিই নয়।

২। কোন পদ্ধতিতে খননের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের বয়স নির্ধারণ করা হয়?
- ক) এরিয়াল জরিপ পদ্ধতিতে
- খ) মাঠ জরিপ পদ্ধতিতে
- গ) ভৌগোলিক জরিপ পদ্ধতিতে
- ঘ) কার্বন ডেটিং পদ্ধতিতে

পাঠ-৩.২ প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের শ্রেণি বিভাগ এবং প্রাচীন, মধ্য ও নব্যপ্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য

Types of Society based on Archaelogy and Socio-Economic Characteristics of Paleolithic, Mesolithic and Neolithic Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- প্রত্নতত্ত্বের ভিত্তিতে সমাজের ধরন বলতে পারবেন;
- প্রাচীন প্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- মধ্য প্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- নব্য প্রস্তর যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রাচীন প্রস্তর যুগ, প্রস্তর যুগ মধ্য, নব্য প্রস্তর যুগ।

সমাজ প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই আদিম সমাজ থেকে আধুনিক সমাজের উদ্ভব ও বিকাশ সাধিত হয়েছে। ধীরে ধীরে পরিবর্তনের মাধ্যমে উন্নত রূপ লাভ করাকে সমাজের বিবর্তন বলে অভিহিত করা হয়। বিবর্তনের মাধ্যমেই সমাজ প্রাগৈতিহাসিক বা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক যুগে পদার্পন করেছে। নানা উপাদান ও দৃষ্টিকোণ থেকে মনীষীরা বিবর্তিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি বিভাজন করেছেন। ফলে সমাজের বিভিন্ন ধরন পরিলক্ষিত হয়। খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানের ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাজের যে শ্রেণি বিভাজন (স্তর) করেছেন তা হচ্ছে:

ক) প্রাচীন প্রস্তর যুগ (Paleolithic age)
খ) মধ্য প্রস্তর যুগ (Mesolithic age)
গ) নব্য প্রস্তর যুগ (Neolithic age)
ঘ) তাম্রযুগ (Copper age)
ঙ) ব্রোঞ্জ যুগ (Bronze age)
চ) লৌহ যুগ (Iron age)

উল্লিখিত প্রতিটি সমাজের স্বকীয় আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সমাজেরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এ পরিবর্তন মূলত উন্নতি ও সমৃদ্ধির। অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয়তা এবং প্রচেষ্টা মানুষকে নতুন জ্ঞান ও আবিষ্কারের সন্ধান দিয়েছে। মানুষের নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় সমাজ হয়েছে আরো উন্নত। বিবর্তিত সমাজের শ্রেণি বিভাজনের মধ্য দিয়ে আমরা সে বার্তাই পাই।

প্রাচীন প্রস্তর যুগ

প্রাচীন প্রস্তরযুগ-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হল Paleolithic Age। গ্রিক শব্দ Palaeo (পুরো > পুরাতন) এবং Lithos (পাথর) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে Paleolithic/Palaeolithic শব্দটি গঠিত। এ যুগটি ছিল প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়। প্রাগৈতিহাসিক এ যুগকে সময়ের হিসেবে সবচেয়ে দীর্ঘতম বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ১০ থেকে ১৫ লক্ষ খ্রিস্টপূর্ব অব্দ পর্যন্ত প্রাচীন প্রস্তরযুগের সময়কাল বিবেচনা করা হয়। তবে প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি না পাওয়ায় আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ ও ইতিহাস গবেষকেরা এ যুগের সময়কাল সংক্ষিপ্ত করে ১ লক্ষ থেকে ১০ হাজার বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন। এ যুগে অবিকৃত, অমসৃণ ও স্থূল পাথরের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছে। যাবতীয় তথ্য-প্রমাণ থেকে দাবি করা হয়েছে যে, মানবসভ্যতার প্রাথমিক বিকাশ প্রাচীন প্রস্তরযুগ বা পুরোপলীয় যুগেই ঘটেছিলো। প্রাচীন প্রস্তরযুগটি ছিল প্রস্তরযুগের প্রথম পর্যায়। নিম্নে প্রাচীন প্রস্তরযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

ক) খাদ্য: প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। শিকার ও খাদ্য আহরণের দ্বারা মানুষ ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণ করত। খাদ্যতালিকায় ছিল ফলমূল, লতাগুল্ম, শাক-সবজি, পাখির ডিম, কীট-পতঙ্গ, ছোট বড় জীবজন্তুর মাংস, শামুক, ঝিনুকসহ জলজ অন্যান্য উদ্ভিদ ও প্রাণী ইত্যাদি।

খ) বাসস্থান: পুরোপলীয় যুগে দীর্ঘদিন মানুষ গাছের ডালে, গাছের কোটরে, পাহাড়ের গুহায়, মাটির গর্ত প্রভৃতি স্থানে বসবাস করত। পরবর্তীতে তারা ঘরবাড়ি বানানোর কৌশল আয়ত্ত করে।

গ) বস্ত্র ও অলঙ্কার: পুরোপলীয় যুগের মানুষ প্রথমদিকে জীবজন্তুর মতো উলঙ্গ থাকত। পরবর্তীতে তারা গাছের পাতা, ছাল-বাকল ইত্যাদি লজ্জা-নিবারণে ব্যবহার করত। শেষ পর্যায়ে এসে পশুর চামড়া ও লোম দিয়ে পোশাক তৈরি করত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গহনা ব্যবহারের প্রচলন ছিল।

ঘ) হাতিয়ার: প্রাচীন প্রস্তরযুগের মানুষ বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরি করত। পাথরের পাশপাশি বাঁশ, গাছের ডাল, পশুর হাড়, দাঁত, শিং ইত্যাদি দিয়েও হাতিয়ার তৈরি করা হত।

ঙ) সমাজ জীবন: প্রাকৃতিক বৈরিতা এবং শ্বাপদসংকুল পরিবেশে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে মানুষ প্রাচীন প্রস্তর যুগেই যূথবদ্ধ জীবন-যাপন শুরু করে। পরিবার ও সমাজের নেতৃত্ব বিষয়ে বিতর্ক থাকলেও অনেকেই মনে করেন যে তখন পরিবার ও সমাজের নেতৃত্ব নারীদের ওপর ন্যস্ত ছিল।

চ) ধর্ম: প্রাকৃতিক বৈরিতা থেকে মুক্তি, শিকারি জীবনকে সফল করা, আত্মরক্ষা, পূর্বপুরুষের কৃপালাভ প্রভৃতি কারণে এ যুগের মানুষ অদৃশ্য শক্তির সাহায্য প্রার্থনা করত। এভাবে তাদের মনে একটা ধর্মীয় অনুভূতির জন্ম হয়। সমাজবিজ্ঞানী ডুর্খেইম (Durkheim) আদিম ধর্মীয় বিশ্বাসকে টোটেম (Totem) বলে অভিহিত করেছেন।

ছ) চিত্র/শিল্পকলা: প্রাচীন প্রস্তযুগের মানুষ গুহার ভিতরে চিত্রকলার মাধ্যমে তাদের শিকারি জীবন, শিকার প্রাণী শিকারের দৃশ্য, ব্যবহৃত হাতিয়ারাদি, বসন-ভূষণ, জীবনযাপন পদ্ধতি, সংস্কৃতিবোধ, শিল্পবোধ, জাদুবিশ্বাস, ধর্মীয় চেতনা, দার্শনিক চিন্তা ইত্যাদি চিত্রকলা ফুটিয়ে তুলেছে।

জ) আবিষ্কার: প্রস্তরযুগেই মানুষ আগুন আবিষ্কার করেছিল। তারা আগুনের ব্যবহার জানত এবং তা সংরক্ষণ করতে পারতো।

ঝ) শ্রম বিভাজন: প্রাচীন প্রস্তরযুগে খাদ্য সংগ্রহ কর্মকান্ডে শ্রমবিভাগের সূত্রপাত হয় বলে অনেক পন্ডিত মনে করেন। এসময় মেয়েরা ফলমূল সংগ্রহ, পুরুষেরা শিকার করতো। অল্পবয়সীরা ছোটখাটো জীবজন্তু ও মাছ শিকার এবং বয়স্কদের কাজে যথাসম্ভব সহযোগিতা করত। বৃদ্ধরা অস্ত্র তৈরি ও বুদ্ধি-পরামর্শ দিয়ে সহায়তা দিত। তৎকালীন সমাজে শ্রমভেদ থেকেই সামাজিক স্তরভেদের জন্ম হয়।

মধ্য প্রস্তর যুগ

মধ্য প্রস্তরযুগ হচ্ছে প্রাচীন প্রস্তরযুগের প্রান্তিক পর্যায় এবং নব্য প্রস্তরযুগের প্রারম্ভিক পর্যায়। ইউরোপে এ যুগ প্রায় **১১** হাজার থেকে ৫ হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আফ্রিকা, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে এ যুগের অনেক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য প্রস্তরযুগে ইউরোপের তৃণভূমি বা তুন্দ্রা অঞ্চলে গভীর বন-বনানীর সৃষ্টি হয়। চতুর্থ বরফযুগের পরবর্তী সময়ে বেঁচে যাওয়া মানুষেরা নতুনভাবে প্রকৃতির সাথে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয় এবং এরা মধ্যপলীয় সংস্কৃতির জন্ম দেয়। এখানে মধ্য প্রস্তরযুগের সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হল:

ক) খাদ্য: মধ্য প্রস্তর যুগেও মানুষ ছিল খাদ্য-সংগ্রহকারী। তখনো তারা খাদ্য উৎপাদন করতে শেখেনি। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল পশুপাখি ও মাছ। মাছকে শুঁটকি করে তারা সংরক্ষণ করতো। মাছ ছাড়াও তারা বিভিন্ন ধরনের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণীকে খাদ্য তালিকার অর্ন্তভূক্ত করেছিল।

খ) হাতিয়ার: মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষ পূর্বের তুলনায় হাতিয়ারের উৎকর্ষ বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়। এ সময়ের প্রধান অস্ত্র ছিল তীর-ধনুক। এ যুগে মৎস্যশিকারে বঁড়শি, হারপুন, নৌকা, জাল ব্যবহৃত হত। হস্তকুঠার ছাড়াও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রে তারা কাঠের হাতল সংযুক্ত করেছিল। পশুর হাড়, শিং ইত্যাদি দিয়েও অস্ত্র তৈরি হত।

গ) ধর্ম: মধ্যপ্রস্তরযুগের মানুষ ধর্ম ও জাদুবিদ্যায় বিশ্বাসী ছিল। সর্বপ্রাণবাদ, মহাপ্রাণবাদ, বস্তুভক্তি ও পূর্বপুরুষ পূজা ছিল তাদের ধর্ম সংক্রান্ত মূল মতবাদ।

ঘ) সমাজ জীবন: মধ্যপলীয় যুগের মানুষ ছিল আধা-যাযাবর, আধা-স্থায়ী। এ যুগের মানুষ মূলত দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি শাখানদী ও সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল এবং অন্যটি মূল ভূমিতেই অবস্থান করে। মধ্যপলীয় যুগে মানুষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে বসবাস করত। অন্তঃ ও আন্তঃদলীয় সম্পর্ক ভালো ছিল।

ঙ) চিত্র/শিল্পকলা: এ সময় চিত্রকলায় আগের তুলনায় বিষয়বস্তু এবং অঙ্কন রীতিতে পরিবর্তন আসে। জ্যামিতিক নকশার আনুকরণে মানুষ ও জীবজন্তুর মূর্ত ছবিও গুহার দেয়ালে অঙ্কন করা হত। জলাশয়ের তীরবর্তী বস-বাসকারী মানুষের চিত্রকর্মে পানি ও পানিনির্ভর জীবনযাপন প্রণালী প্রতিফলিত হয়েছে।

চ) আবিষ্কার: মধ্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা আগুনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ ও গহনার ব্যবহার বাড়ায়। ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তির ধারণার প্রাথমিক বিকাশও এ সময়ে ঘটেছে বলে মনে করা হয়।

নব্য প্রস্তর যুগ

'নব্যপ্রস্তর' শব্দটি এসেছে ইংরেজি Neolithic প্রতিশব্দ থেকে। গ্রিক শব্দ Neo (নব > নতুন) এবং Lithos (পাথর) এর সমন্বয়ে Neolithic শব্দটির উদ্ভব। বিখ্যাত ইংরেজ প্রত্নতত্ত্ববিদ Sir John Lubbock ১৮৬৫ সালে প্রথম Neolithic শব্দটি ব্যবহার করেন। আনুমানিক ৮০০০-৩৫০০ খ্রিস্টপূর্ব অব্দের মধ্যে ও নিকট প্রাচ্যে নব্য প্রস্তরযুগের প্রথম বিকাশ ঘটে। অতঃপর ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল এবং অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দে ইংল্যান্ডে এ যুগের সূচনা হয়। সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে নব্য প্রস্তরযুগ একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড (Gordon Childe) খাদ্য-আহরণ পর্যায় থেকে খাদ্য উৎপাদনের জন্য কৃষিকাজে উত্তরণকে নব্য প্রস্তরযুগের বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। নিম্নে নব্য প্রস্তরযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ক) খাদ্য উৎপাদনের সূচনা: কৃষিকাজের মাধ্যমে নব্য প্রস্তরযুগের মানুষেরা খাদ্য-উৎপাদনমুখী এক সৃজনশীল যুগের সূচনা করে। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজের সূচনা করাই ছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানব সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উদ্ভাবন। এ সময়ের উৎপাদিত ফসল হল গম, যব, মটরশুঁটি, ডাল, কাউন, জোয়ার, মিষ্টি আলু, ভুট্টা, সীম, বরবটি, লাউ, নারকেল, খেজুর, জলপাই, ডুমুর, আঙ্গুর, এবং অসংখ্য লতা-পাতা, শাক-সবজি ইত্যাদি।

খ) পশু পালন: মানুষের শিকারের সঙ্গী হয়েছিল কুকুর। একপর্যায়ে কুকুর গৃহপালিত পশুতে পরিণত হয়। পশুর দুধ, মাংস এবং পাখির ডিম তাদের খাদ্যের অনিশ্চয়তা দূর করে এবং চামড়া বস্ত্রের চাহিদা মেটায়। এছাড়াও পরিবহন, ভূমিকর্ষণ, পশু-সংগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে পশুর ব্যবহার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পশু-পাখির গৃহপালিতকরণ নবোপলীয় যুগের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য।

গ) গৃহ নির্মাণ: নব্য প্রস্তরযুগের শেষদিকে এসে গুহাবাসী মানুষ কৃত্রিম আবাসস্থল গড়ে তোলে। প্রথমে তারা বনের গাছপালা ও তৃণ দিয়ে কুড়েঘর নির্মাণ করতো। রোদ-বৃষ্টি, ঝড়সহ যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য গৃহ ছিল নিরাপদ আশ্রয়স্থল। কালক্রমে মানুষ গৃহের বহুবিধ উন্নতি সাধন করেছিল।

ঘ) হাতিয়ার: নব্য প্রস্তরযুগের হাতিয়ার অধিক মসৃণ, ধারালো, হালকা ও কার্যকরী করে তৈরি করা হত। হাতিয়ারের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের জন্যই এ যুগকে নয়া পাথরের যুগ বলে অভিহিত করা হয়। এ যুগের শেষদিকে কৃষিকাজে লাঙলের ব্যবহারও শুরু হয়।

ঙ) আবিষ্কার: নব্য প্রস্তরযুগের গুরুত্বপূর্ণ একটি কীর্তি হল চাকার আবিষ্কার। চাকার আবিষ্কার, মৃৎশিল্প, তাঁতশিল্প, পরিবহন এবং যুদ্ধকৌশলে (যুদ্ধে পাথর ব্যবহার) পরিবর্তন ঘটায়। কৃত্রিম পদ্ধতিতে আগুন জ্বালানোর কৌশল আয়ত্ত এবং এর ব্যাপক ব্যবহার নব্য প্রস্তর যুগের অর্জন। মূলত চকমকি পাথর ছিল এ সময়ের মানুষের দিয়াশলাই। উদ্বৃত্ত ফসল সংরক্ষণ, রন্ধনকার্য, খাদ্য ও পানীয় সংরক্ষণ কাজে মৃৎপাত্র ব্যবহার করা শুরু হয়। নব্য প্রস্তরযুগের শেষপর্যায়ে এসে সীমিত আকারে তামার ব্যবহার শুরু হয়।

চ) বস্ত্রশিল্প: এ যুগে তাঁত বা বয়ন শিল্পের বিকাশ ঘটে। বয়নশিল্পে প্রথম শণ, পরে ভেড়া ও ছাগলের লোম, তুলা এবং শেষে রেশমগুটি কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এ যুগে এশিয়াতে তুলা উৎপাদন শুরু হলে তাঁতশিল্পের অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধিত হয়।

ছ) শ্রমবিভাজন: নব্য প্রস্তরযুগে শ্রমবিভাজন সংহত রূপ লাভ করে। এ সময় পুরুষেরা হাতিয়ার তৈরি, পশুপালন, শিকার, ঘরবাড়ি তৈরি ও কৃষিকাজ করত। নারীরা ফসল সংরক্ষণ, বস্ত্রবয়ন, মৃৎপাত্র তৈরি, সন্তান প্রতিপালন ও ঘরকন্যার কাজে ব্যস্ত থাকত।

জ) সামাজিক অবস্থা: নব্য প্রস্তরযুগে বিবাহ ও পরিবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এ সময়ে সংঘবদ্ধভাবে বসবাস অনিবার্য হওয়ায় মানুষ ক্ল্যান, পরিবার ও ট্রাইব গঠন করে। পরিবার নবোপলীয় যুগের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। নবোপলীয় যুগে মানুষের মধ্যে সত্যিকার অর্থে-সামাজিক শ্রেণিভেদ বা স্তরভেদ দেখা দেয়। দলপতির আবির্ভাব, যুদ্ধে পরাজিতদের দাসে পরিণতকরণ, ধর্মগুরু ও অভিজাত শ্রেণি সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজে শোষক-শোষিত বা প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। ক্ষমতা, ধন-সম্পত্তি এবং মর্যাদাকে কেন্দ্র করেও সামাজিক স্তরভেদ প্রকট হয়ে ওঠে। নব্য প্রস্তরযুগে ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। ।

ঝ) ভাষা ও শিল্পকলার বিকাশ: নব্য প্রস্তরযুগে কথ্যভাষার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। মনের ভাব প্রকাশের জন্য কথা বা ভাষার ব্যবহার শুরু হয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, অঙ্কন, প্রভৃতি শাখায়ও বিকাশ লাভ করে।

ঞ) ধর্ম ও যাদুবিদ্যা: নবোপলীয় যুগে রোগ-শোক, মৃত্যু, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন, বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয়, কীট-পতঙ্গ ও জীবজন্তুর হাত থেকে নিজেদের জীবন ও ফসল রক্ষা, শিকার, যুদ্ধজয়, শুভ-অশুভ ধারণা, আত্মা-প্রেতাত্মায় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় থেকে যাদুবিদ্যা ও ধর্মবিশ্বাস প্রবল হয়ে ওঠে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নব্য প্রস্তরযুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতার সূচনা হয়েছিল প্রাচীন প্রস্তর বা পুরোপলীয় যুগে। মধ্য ও নব্য প্রস্তর যুগে সভ্যতার বিকাশ সাধিত হয়েছে। নব নব আবিষ্কার মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যে নতুনত্ব এনেছে। গুহাবাসী মানুষ হয়েছে গৃহবাসী। শিকার ও সংগ্রহভিত্তিক অনিশ্চিত অর্থনীতি থেকে মানুষ খাদ্য উৎপাদনের নিরাপদ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেল খাদ্যের নিশ্চয়তা মানুষের সৃজনশীলতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমাজে শ্রমবিভাজন, শ্রেণি বৈষম্য প্রভৃতি নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সমাজের কয়টি শ্রেণি বিভাজন (স্তর) করেছেন?
 ক) চারটি খ) পাঁচটি
 গ) ছয়টি ঘ) সাতটি

২। Neolithic শব্দটি
 ক) ফরাসি খ) জার্মান
 গ) ল্যাটিন ঘ) গ্রিক

৩। “নবপলীয় বিপ্লব” শব্দটি কে ব্যবহার করেন?
 ক) গর্ডন চাইল্ড খ) ই. বি. টেইলর
 গ) ডুর্খেইম ঘ) ম্যাক্স ওয়েবার

পাঠ-৩.৩ তাম্র, ব্রোঞ্জ ও লৌহযুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য
Socio-Economic Characteristics of Copper, Bronze and Iron Age

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- তাম্র যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ব্রোঞ্জ যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য লিখতে পারবেন;
- লৌহ যুগের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জ যুগ, লৌহযুগ।

প্রত্নতাত্ত্বিকযুগের শেষ পর্যায়গুলো যথাক্রমে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জযুগ এবং লৌহযুগ। তাম্রযুগে হাতুড়ি ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র তৈরিতে তামার ব্যবহার শুরু হয়। তাছাড়া তামার মুদ্রা ও তামার তৈজসপত্রও ব্যবহৃত হয়। এরপর তামা ও টিনের সংমিশ্রণে ব্রোঞ্জ নামক ধাতব পদার্থটি তৈরি হয়। ব্রোঞ্জযুগের বড় সাফল্য হলো লেখা আবিষ্কার। লৌহযুগে কৃষি, শিল্প, যানবাহন, গৃহনির্মাণ, যন্ত্রপাতি তৈরি, যাতায়াত ব্যবস্থা তথা প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে লোহার ব্যাপক ব্যবহার আধুনিক সভ্যতার জন্ম দেয়।

তাম্রযুগ

খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের শেষদিকে ইউরোপে এবং নিকট প্রাচ্যে তাম্র যুগের সূচনা ঘটে। তাম্রযুগে প্রবেশের মধ্য দিয়ে নগরসভ্যতার সূচনা হয়। তবে তাম্রযুগে পাথরের ব্যবহারও চলমান ছিল। তামার ব্যবহার ছিল সভ্যতার নতুন সংযোজন। এ অবস্থাকে তাম্রপলীয় যুগ নামে আখ্যায়িত করা হয়। মানুষের প্রথম ব্যবহৃত ধাতু হল তামা। ধারণা করা হয় যে, কৃষিযুগে মাটির হাঁড়ি-পাতিল পোড়াতে গিয়ে প্রথম তামা আবিষ্কৃত হয়। কারণ মালাকাইট (তামার আকর) পুড়লে তামা গলে আলাদা হয়ে বেরিয়ে আসে। প্রাচীন মিশর, সিরিয়া ও অ্যাসিরিয়ার অধিবাসীরা ব্যাপকভাবে তামার ব্যবহার জানত। বস্তুত সুমেরের নগরসভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল তামা ব্যবহারের মধ্যদিয়ে। তবে তামার দুস্প্রাপ্যতা এবং এর কিছুকাল পর ব্রোঞ্জযুগের আগমনে তাম্রযুগ দীর্ঘায়িত হয়নি।

পাথরের স্থলে তামার হাতিয়ার ও তৈজসপত্রের ব্যবহারের কারণে শ্রমের উৎপাদনশক্তি বৃদ্ধি পায়। ফলে মানব সভ্যতায় প্রথম অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাগ সৃষ্টি হয়। তামা বিক্রি করে কিছু লোক প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শক্তিশালী রাষ্ট্রযন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের বিকাশ ঘটে। প্রাচীন মিশরের পিরামিড যুগের সভ্যতা ও সিন্ধুসভ্যতা তাম্র ও ব্রোঞ্জযুগের সভ্যতা।

ব্রোঞ্জযুগ

মেসোপটেমিয়া, মিশর, ভারত এবং চৈনিক সভ্যতায় ব্রোঞ্জের আবিষ্কার হয়। ধীরে ধীরে ব্রিটেন, সুইডেন, ডেনমার্ক ও উত্তর জার্মানীতে এর বিস্তার ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দ পর্যন্ত ব্রোঞ্জযুগ স্থায়ী হয়। ব্রোঞ্জযুগে এসে নগরসভ্যতা আরো বিকশিত হয়। নগরায়নের ফলে শ্রমবিভাগের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। শ্রমবিভাগকে কেন্দ্র করে সমাজে পৃথক শ্রেণি বিভাজন ও স্তরবিন্যাস গড়ে ওঠে। ব্রোঞ্জযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। দ্রব্য বিনিময়ের পরিবর্তে ব্রোঞ্জের তৈরি মুদ্রা অর্থনীতির বিকাশ ঘটে। এ যুগে লেখা আবিস্কৃত হয়। ফলে শিক্ষা ও জ্ঞানরাজ্যে নতুন যুগের আগমন ঘটে। ব্রোঞ্জ-নির্মিত বর্ম, শিরস্ত্রাণ, বর্শা, তলোয়ার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। সামন্ত রাজাগণ ব্রোঞ্জের অস্ত্রের সাহায্যে সজ্জিত হয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যগুলো আক্রমণ ও দখল করে নতুন নতুন উপনিবেশ স্থাপন করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনও ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। শ্রেণীবিন্যাস বিস্তৃত হওয়ায় সমাজকাঠামোতে গুণগত পরিবর্তনের সূচনা হয়। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশংকায় নগরের চারপাশ প্রাচীর স্থাপন করা হয়। জলসেচ ও বাঁধ

নির্মাণের ওপর ভিত্তি করে মিশরে কেন্দ্রীয় সম্রাটের শাসন কার্যকর হয়। কার্ল উইটফোগাল (Karl Wittfogel) যাকে পানিভিত্তিক সভ্যতার (Hydrolic civilization) উদ্ভব বলে অভিহিত করেছেন। আর যে সমস্ত অঞ্চলে জলসেচ ও বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজন ছিল না, সেখানে গড়ে ওঠে ছোট ছোট নগররাষ্ট্র। তীব্র শ্রেণিবিন্যাস, দাসভিত্তিক শ্রম ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কর আদায়ের প্রয়োজনে কঠোর ও শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটে। সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য এ সময় আইনের উৎপত্তি হয়।

লৌহযুগ

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রোঞ্জযুগের একচেটিয়া অধিকার ও কর্তৃত্ব হ্রাস পেয়েছিল। ব্রোঞ্জ ছিল দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান ধাতু। এর ব্যবহার মূলত অভিজাত শ্রেণির হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। সহজলভ্য ও দামে সস্তা হওয়ায় লোহার ব্যাপক ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। সাধারণ মানুষও তাদের দৈনন্দিন নানা প্রয়োজনে লৌহ নির্মিত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে শুরু করে। এভাবেই লৌহযুগ নামে নতুন এক সভ্যতার বিকাশ লাভ ঘটে। এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটরা (Hittites) প্রথম লোহার আবিষ্কার ও এর ব্যবহার শুরু করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে মধ্যপ্রাচ্যে লোহার ব্যবহার শুরু হয়।

লোহার আবিষ্কার ও ব্যবহার সভ্যতার সামাজিক ভিত্তিকে অনেক মজবুত এবং এর পরিধিকে আরও প্রসারিত করে। লৌহযুগে বর্ণমালাভিত্তিক লিখন পদ্ধতির প্রচলন শুরু হয়। ব্যবসাবাণিজ্য ও মুদ্রা-অর্থনীতি ব্যাপকতা লাভ করে। জাহাজ চলাচল ব্যাপকভাবে শুরু হওয়ার ফলে যাতায়াতব্যবস্থা সহজ হয়। এর ফলে বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলের মানুষের মধ্যে আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ও ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পায়। গৃহনির্মাণ, বিভিন্ন ধরনের গৃহসামগ্রী, আসবাবপত্র, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কুঠার, লাঙলের ফলা, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে লোহার ব্যবহারের মাধ্যমে সভ্যতার দ্রুত উত্থান ঘটে। উৎপাদন ব্যবস্থায় যন্ত্রশক্তির প্রয়োগ আরও সহজ হয়। ফলে শিল্পবিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। মানুষের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস, কাল্পনিক ও অযৌক্তিক ধ্যান-ধারণার পরিবর্তে যৌক্তিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ ঘটে। লৌহযুগে শিল্প, বাণিজ্য, নগরায়ন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক সামাজিক শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এতে সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিবিন্যাস আরও জটিল ও বিস্তৃত হয় এবং সমাজকাঠামোতে আমূল পরিবর্তন আসে। লৌহযুগে গ্রিসে এক উন্নত গণতান্ত্রিক নগরসভ্যতার বিকাশ ঘটে।

শিক্ষার্থীর কাজ	একটি ছকের মাধ্যমে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগের তুলনা করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

মানব সভ্যতা বিকাশের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর হচ্ছে তাম্রযুগ, ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ। এর মাধ্যমে মানুষ পাথরের যুগ থেকে ধাতুর যুগে প্রবেশ করে। নগর সভ্যতার মাধ্যমে তারা আধুনিক সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটায়। বিনিময় ব্যবস্থার পরিবর্তে মুদ্রা অর্থনীতি চালু হয়। কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা বিকশিত হওয়ার পাশাপাশি শিল্পভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। সর্বপ্রথম কবে তামার ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

ক) খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের প্রথম দিকে
খ) খ্রিস্টপূর্ব ৪০০০ অব্দের শেষদিকে
গ) খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ অব্দের শেষদিকে
ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের প্রথম দিকে

২। খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে কোন অঞ্চলে লোহার ব্যবহার শুরু হয়?

ক) ইউরোপে
খ) আফ্রিকায়
গ) মধ্যপ্রাচ্যে
ঘ) আমেরিকায়

পাঠ-৩.৪ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহ : ময়নামতি
Major Archaeological Sites of Bangladesh: Mainamati

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানসমূহের নাম বলতে পারবেন;
- ময়নামতির অবস্থান, উৎপত্তি ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, ময়নামতি, শালবন বিহার, কোটিলা মুড়া, প্রত্নসামগ্রী, আনন্দ বিহার।

সমাজ, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে বাংলাদেশ এক গৌরবময় জনপদ। প্রাচীনকালেই এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছিল বলে ধারণা করা হয়। মধ্যযুগে এ জনপদে বিভিন্ন গৌরবময় সভ্যতার স্ফুরণ ঘটেছিল। প্রাচীন বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং বৈচিত্র্য যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক জীবনও ছিল সমৃদ্ধ, মনোমুগ্ধকর। বাংলার রূপ-রস, আলো-বাতাস, খাদ্য-পানি এবং মানুষের সান্নিধ্য সবাইকে কাছে টেনেছে, আপন করেছে। সুপ্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের উর্বর ক্ষেত্র ছিল এই বঙ্গভূমি। আবার অসীম ঔদার্যে আর্যদেরকেও ঠাঁই দিয়েছিল এই বাংলা। বৌদ্ধ-জৈন, আর্য-অনার্য, কোল-ভীল-সাঁওতাল সবাই মিলে এক সমৃদ্ধ সমাজ ও সভ্যতা গড়ে তুলেছিল ‘বাঙাল মুলুকে’।

প্রাচীন বাংলার সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে চর্যাপদ। খ্রিস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত চর্যাপদ বাংলার সমাজ, ধর্ম ও জীবনপ্রণালীর এক গুরুত্বপূর্ণ স্মারক। বাংলার অতীশ দীপঙ্কর প্রায় হাজার বছর আগে জ্ঞানের মশাল জ্বেলে গোটা তিব্বতকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য ছিলেন বাঙালি শীলভদ্র। সেসময়ে সমগ্র ভারতে তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ পন্ডিত বলে স্বীকৃত ছিলেন। এ ধারাবাহিকতায় বাংলার জনপদে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। বিকশিত হয় গৌরবময় সভ্যতা। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সভ্যতা হচ্ছে:
ক) ময়নামতি, কুমিল্লা;
খ) মহাস্থানগড়, বগুড়া;
গ) পাহাড়পুর, নওগাঁ এবং
ঘ) উয়ারি-বটেশ্বর, নরসিংদী।

ময়নামতি, কুমিল্লা

অবস্থান: কুমিল্লার ময়নামতি বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। কুমিল্লা জেলা শহরের সাত কিলোমিটার পশ্চিমে কোটবাড়ি এলাকায় বাংলাদেশ পল্লি উন্নয়ন একাডেমি অবস্থিত। এখান থেকে দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে ময়নামতির শালবন বিহার ধ্বংসাবশেষ। সমগ্র প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাটি ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ি অঞ্চলের প্রায় ১১ মাইল এলাকা জুড়ে অবস্থিত। শালবন বিহারের সন্নিকটে স্থাপিত যাদুঘরে ময়নামতিতে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নসামগ্রী সংরক্ষণ করা হয়েছে।

উৎপত্তি ও নামকরণ: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কুমিল্লা বিমানবন্দরসহ বিভিন্ন নির্মাণকাজের সময় ময়নামতিতে ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ না করে খনন ও নির্মাণকাজের ফলে এখানকার নির্দশনগুলো ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। গবেষণায় প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ময়নামতিতে বৌদ্ধধমকে কেন্দ্র করে এক উন্নত সভ্যতার বিকাশলাভ ঘটে। ১৯৫৫-৫৬ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানে জরিপ কাজের মাধ্যমে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে ৫৪টি স্থান সংরক্ষণ করার জন্য চিহ্নিত করে। চিহ্নিত স্থানগুলোর কয়েকটিতে খননকার্য চালিয়ে ময়নামতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার অনেক নিদর্শন উদ্ধার করে।

অষ্টম শতাব্দীতে রাজা বুদ্ধদেব ময়নামতি বিহার প্রতিষ্ঠা করেন বলে ধারণা করা হয়। ৯ম ও ১০ম শতকে এ অঞ্চলে চন্দ্রবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের আধিপত্য ছিল। চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মধ্যে প্রখ্যাত ছিলেন রাজা মানিক চন্দ্র। মানিক চন্দ্রের মৃত্যুর পর রাণী ময়নামতি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে রাজকার্য পরিচালনা করেন। রাণী ময়নামতির নামানুসারে এ স্থানের নামকরণ হয় ময়নামতি।

ময়নামতির প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: ময়নামতিতে আবিস্কৃত প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

ক. শালবন বিহার: অধিকসংখ্যক শালবৃক্ষের কারণে এই স্থাপনার নাম 'শালবন বিহার' বলে মনে করা হয়। এখানে চতুষ্কোণ আকৃতির একটি বিরাট বৌদ্ধবিহার পাওয়া গেছে। ইট-নির্মিত বিহারের প্রতিটি দেওয়াল প্রায় ১৬৮ মিটার লম্বা। মূল বিহারটি ১৬ ফুট প্রশস্ত ও ৪-৬ ফুট উঁচু দেওয়াল দ্বারা পরিবেষ্টিত। উত্তর দিকে ইট নির্মিত ৫৩ ফুট দীর্ঘ রাস্তা রয়েছে। এটিই একমাত্র প্রবেশপথ। সাড়ে বাইশ মিটার প্রশস্ত তোরণ দিয়ে ৩৩ বাই ২৪ ফুট হলঘরে প্রবেশ করা যায়। বিহারের চতুর্দিকে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য ১২ বাই ১২ ফুট ১১৫ টি কক্ষ রয়েছে। এসব কক্ষ দেয়াল দিয়ে একটি থেকে আরেকটিকে পৃথক করা হয়েছে। কক্ষগুলোতে বুদ্ধমূর্তি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রী রাখার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল।

খ. কোটিলা মুড়া: শালবন বিহার হতে ৫ কিলোমিটার উত্তরে সেনানিবাস অঞ্চলে কোটিলা মুড়া অবস্থিত। একটি টিলার উপর তিনটি স্তূপের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এ তিনটি স্তুপকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান তিনটি প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এগুলো হচ্ছে ক) বুদ্ধ (জ্ঞান), খ) ধর্ম (ন্যায়) এবং গ) সংঘ (শৃঙ্খলা)।

গ. চারপত্র মুড়া: কোটিলা মুড়া থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সেনানিবাসের মধ্যেই একটি ছোট পাহাড়ের উপরে চারপত্র মুড়ার অবস্থান। এটি মূলত একটি সমাধিক্ষেত্র। সমাধিস্থলের পূর্বদিকে একটি হলঘর আবিষ্কৃত হয়েছে। চারপত্র মুড়ার প্রায় দুই কিলোমিটার উত্তরে ১০৫ ফুট দীর্ঘ ও ৫৫ ফুট প্রস্থ একটি বৌদ্ধমন্দির পাওয়া গেছে।

ঘ. রাণি ময়নামতির প্রাসাদ: ময়নামতি-লালমাই পাহাড়শ্রেণির উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত এবং সংলগ্ন ভূমি থেকে কিছুটা উঁচু স্থানে রাণি ময়নামতির প্রাসদের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সম্প্রতি খননের ফলে বড় আকারের প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়েছে।

ঙ. আনন্দ বিহার : এ অঞ্চলে প্রাপ্ত বৌদ্ধ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে আনন্দ বিহার সবচেয়ে বড়। এই বিহারকে আনন্দ রাজার বাড়ি বলে মনে করা হয়। কোটিলা মুড়া থেকে এক কিলোমটার দক্ষিণে ময়নামতি-লালমাই পাহাড়ের উপত্যকায় সমতল ভূমিতে আনন্দ বিহার অবস্থিত। জানা যায়, অষ্টম শতকের দেববংশের রাজা আনন্দ দেব শালবন বিহারের অনুরূপ একটি বিশাল বৌদ্ধবিহার স্থাপন করে বৌদ্ধধর্মের প্রসারে অবদান রেখেছিলেন। আনন্দ বিহারের কয়েকটি দেওয়াল পোড়ামাটির ফলক-চিত্র রয়েছে। সাপ-নেউল, মাছ, শূকর, ময়ূর, রাজহাঁস, ঘোড়া, বানর, যোদ্ধা, সিংহ প্রভৃতির দৃষ্টিনন্দন চিত্র রয়েছে।

চ) ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী: ময়নামতিতে উদ্ধারকৃত প্রত্নসামগ্রীর মধ্যে ০৮টি তাম্র ফলক, ০৩টি স্বর্ণমুদ্রা, ২২৪টি রৌপ্যমুদ্রা, ০৬টি স্বর্ণালঙ্কার, ০২টি ব্রোঞ্জের স্মারকাধার, ব্রোঞ্জনির্মিত অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি, বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তি; অসংখ্য পোড়ামাটির ফলকচিত্র, অলংকৃত ইট, প্রস্তর-ভাস্কর্য, তামারপাত্র, বিভিন্ন ধাতুনির্মিত আংটি, কানের দুল ও হাতের চুড়ি; রৌপ্যখন্ড, লোহার পেরেক, কড়া, বঁড়শি, নানা প্রকার খননযন্ত্র, দা, ছুরি, কাঁচি, শিলনোড়া, পোড়ামাটির অসংখ্য তৈজসপত্র, হাঁড়ি-পাতিল, ইত্যাদি।

ময়নামতির সভ্যতা ধ্বংসের প্রকৃত কারণ আজও জানা যায়নি। এখানে কোনরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ধারণা করা হয়, ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনর্জাগরণের সময় এ বৌদ্ধসভ্যতাটি গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং কালক্রমে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর গুরুত্ব: ময়নামতির সমাজ-ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। ময়নামতির শালবন বিহারে খননের ফলে প্রাপ্ত একটি তাম্রশাসন থেকে দেববংশ নামে এক নতুন বৌদ্ধ রাজবংশ ও তাঁদের বংশানুক্রম পাওয়া যায়। চারপত্র মুড়ায় আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলো চন্দ্র রাজাদের বংশানুক্রম, বিভিন্ন অভিযান ও তাঁদের সময়কার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার পরিচয় তুলে ধরে। এছাড়া এই তাম্রশাসন থেকে জানা যায় যে, শ্রীচন্দ্র থেকে গোবিন্দচন্দ্রের শাসনকাল পর্যন্ত ঢাকার বিক্রমপুরে চন্দ্র রাজাদের রাজধানী ছিল। লালমাই-ময়নামতিতে প্রাপ্ত ২২৭টি স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রমাণ করে

যে, এখানে মুদ্রা অর্থনীতির প্রচলন ছিল। এখানে আবিষ্কৃত আব্বাসীয় খলিফাদের মুদ্রা মধ্যপ্রাচ্যের সাথে তৎকালীন বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্যের সাক্ষ্য দেয়। এখানে প্রাপ্ত বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিসমূহ বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের সুবর্ণযুগের পরিচয় বহন করে। শালবন বিহারের ক্রুশাকার মন্দিরের ভিত্তিভূমি অলংকৃত পোড়ামাটির ফলকচিত্রগুলো তৎকালীন বাংলার লোকায়ত শিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী তৎকালীন সমাজের গতিপ্রকৃতি বোঝার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে ময়নামতি দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার খ্রিস্টীয় ৭ম-১২শ শতাব্দীর শিল্প, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ঐতিহাসিক দলিল।

শিক্ষার্থীর কাজ	ময়নামতিতে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।	**সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বৃহত্তর বাংলা উপমহাদেশের এক প্রাচীন জনপদ। এ জনপদের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাচীন ও মধ্য যুগে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে আবিষ্কৃত ময়নামতি, মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর এবং উয়ারি বটেশ্বর বাংলার প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহাসিক স্মারক। ময়নামতিতে অবস্থিত শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, কোটিলা মুড়া, চারপত্র মুড়া, মন্দির প্রভৃতি তৎকালীন বৌদ্ধ সংস্কৃতির পরিচায়ক। এখানে প্রাপ্ত অন্যান প্রত্নসামগ্রী থেকে তৎকালীন সমাজ জীবন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কার নামানুসারে “ময়নামতি” নামকরণ হয়েছে?

ক) পাহাড়ের নামানুসারে
খ) রাজা মানিক চন্দ্রের নামানুসারে
গ) ধর্মীয় আদর্শ থেকে
ঘ) রাণি ময়নামতির নামানুসারে

২। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য শালবন বিহারে কতটি কক্ষ আবিস্কৃত হয়েছে?

ক) ১১০টি
খ) ১১৫টি
গ) ২১০টি
ঘ) ২১৫টি

৩। ময়নামতিতে বিকশিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির বিকাশের আনুমানিক সময়কাল কত?

ক) ৫ম থেকে ৮ম খ্রি. পূ.
খ) ৫ম থেকে ৮ম শতক
গ) ৭ম থেকে দ্বাদশ শতক
ঘ) ১০ম থেকে পঞ্চদশ শতক

পাঠ-৩.৫ পাহাড়পুর
Paharpur

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পাহাড়পুরের অবস্থান ও উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- পাহাড়পুরের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	পাহাড়পুর, প্রত্নসামগ্রী, সোমপুর বিহার, স্নানঘাট, মন্দির, সত্যপিরের ভিটা।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রত্নতাত্ত্বিক দর্শনীয় স্থানের নাম পাহাড়পুর। বৌদ্ধ সংস্কৃতির উৎকর্ষের নিদর্শন হিসেবে পাহাড়পুরের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এটি জাতিসংঘের ইউনেস্কো ঘোষিত বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ। ভারতবর্ষে এতবড় বৌদ্ধ বিহার এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। উৎপত্তিগত দিক থেকে বরেন্দ্র অঞ্চলের এ সভ্যতা ময়নামতির সমসাময়িক। নিম্নে পাহাড়পুরের প্রত্নতাত্ত্বিক পরিচিতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

অবস্থান: বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমে অবিস্থত নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলায় পাহাড়পুরের অবস্থান। নওগাঁ জেলাসদর থেকে পাহাড়পুরের দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। নওগাঁ এবং জয়পুরহাট থেকে পাকা সড়কে পাহাড়পুর যাতায়াত করা যায়। জামালগঞ্জ রেলস্টেশন থেকে পাহাড়পুরের দূরত্ব মাত্র ৫ কিলোমিটার।

উৎপত্তি ও নামকরণ: পাল রাজত্বের প্রথম ভাগে ৮ম শতকের শেষভাগে পাহাড়পুরের বিখ্যাত মন্দির ও বিহার নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে পালবংশের দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা ধর্মপাল ও তাঁর পুত্র দেবপালদের সময়ে বাংলাদেশে বহু বৌদ্ধবিহার ও মন্দির নির্মিত হয়। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ ও হিন্দুসভ্যতা ৮ম থেকে ১৩শ শতক পর্যন্ত স্থায়ী ছিল বলে অনুমান করা হয়। পাহাড়পুরের প্রধান মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে সেই ইটের স্তূপের উপর ধূলাবালি ও মাটি ইত্যাদি জমে কালক্রমে এক উঁচু পাহাড়ের সৃষ্টি হয়। সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের মত উঁচু হওয়ার কারণেই এ এলাকার নামকরণ হয়েছে পাহাড়পুর।

ব্রিটিশ নাগরিক বুকানন হ্যামিল্টন ১৮০৭ এবং ১৮১২ সালে পূর্ব ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। তিনিই প্রথম পাহাড়পুরের প্রত্ননিদর্শনের তথ্য প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ওয়েস্টম্যাকট পাহাড়পুর পরিদর্শন করেন। ১৮৭৯ সালে স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম পাহাড়পুরে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্য পরিচালনা করেন। ১৯২৩ সালে রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি শরৎ কুমার রায়ের অর্থ সাহায্যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহযোগিতায় পাহাড়পুরের মূল খননকাজ শুরু হয়। ভান্ডারকরের নেতৃত্বে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির কিছু গবেষক, প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২৫-২৬ সালে খননকার্য পরিচালনা করেন। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৩৩-৩৪ সাল পর্যন্ত কে. এন. দীক্ষিত পাহাড়পুরে খননকাজ চালান।

পাহাড়পুরের প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: পাহাড়পুর মহাবিহারের আয়তন প্রায় ২৭ একর। বর্গাকৃতির আঙ্গিনার প্রতিটি দিকের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় তিনশ গজ। মূল বিহারটি চারদিক থেকেই উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। প্রতিটি প্রাচীরের গায়ে ভিক্ষুগণের বসবাসের জন্য ছোট ছোট কক্ষ নির্মিত হয়েছিল। মোট ১১৭ টি কক্ষের প্রতিটির সাথেই চওড়া বারান্দা পরিলক্ষিত হয়। পাহাড়পুরে প্রধান যেসব স্থাপনা আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলো হচ্ছে:

ক. সোমপুর বিহার: উপমহাদেশে আবিস্কৃত বিহারগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ হচ্ছে সোমপুর বিহার। উত্তর-দক্ষিণে ২৮১ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৮০ মিটার দৈর্ঘ্য। চতুর্দিকে ১৭৭টি বাসোপযোগী কক্ষ, বিস্তৃত প্রবেশপথ, অসংখ্য নিবেদন-স্তূপ, ছোট ছোট মন্দির রয়েছে। উঁচু ঢিবিতে অবস্থিত মন্দিরের আয়তন ১০৯ মিটার বাই ৯৬ মিটার।

খ) *ক. স্নানঘাট:* সোমপুর বিহারের বাইরের দেওয়াল থেকে ৪৯ মিটার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে স্নানঘাট অবস্থিত। ৪ মিটার প্রশস্ত ঘাটটি ১২.৫ মিটার ঢালু। স্নানঘাটের সিঁড়ি চুনাপাথরে বাঁধানো। রাজা মহীদলের কন্য সন্ধ্যাবতী এ ঘাটে স্নান করতেন বলে লোককথা প্রচলিত আছে।

গ. গন্ধেশ্বরী মন্দির: স্নানঘাট থেকে প্রায় ১২ মিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মন্দিরটি গন্ধেশ্বরী মন্দির নামে পরিচিত। এ মন্দিরের ভিতরে একটি ছোট হলঘর এবং একটি ছোট কক্ষে পূজার স্থান নির্ধারিত ছিল।

ঘ. সত্যপির ভিটা: পাহাড়পুর বিহারের সীমানা প্রাচীরের ১২২ মিটার পূর্বে এ ভিটার অবস্থান। সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ঐশ্বরিক উপায়ে সত্যপিরের জন্ম বিষয়ে লোককাহিনী প্রচলিত আছে। সত্যপিরের নামানুসারে এ ভিটার নামকরণ হয়েছে। এর আগে এটি তারামন্দির নামে প্রসিদ্ধ ছিল বলে জানা যায়।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী: প্রধান মন্দিরের চতুর্দিকে বেষ্টন করে হিন্দু দেবদেবীর ৬৩টি প্রস্তরমূর্তি রয়েছে। ধারণা করা হয়, কোনো প্রাচীন মন্দির থেকে মূর্তিগুলো সংগ্রহ করে প্রধান মন্দিরের শোভা বর্ধন করা হয়েছে। পাহাড়পুরে ২৮০০টি পোড়ামাটির ফলকচিত্র (টেরাকোটা) পাওয়া গেছে। এসব টেরাকোটায় শিব, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ, সূর্য, বোধিসত্ত্বা, পদ্মপাণি, মঞ্জুশ্রী, তারা প্রভৃতি দেবদেবীর মূর্তি স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জীবজন্তু, ফুল-ফল, গাছপালা, সন্তানসহ জননী, স্ত্রী-পুরুষ যোদ্ধা, রথারোহী তীরন্দাজ, পূজারত ব্রাহ্মণ, লাঙল-কাঁধে কৃষক ও বাদ্যযন্ত্র এসব ফলকের মূল উপজীব্য। খননের ফলে মুসলমান যুগের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পাল সম্রাট এবং বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের সময়ের রৌপ্যমুদ্রাও রয়েছে। এছাড়া এখানে মাটির পাত্র, তৈজসপত্র, গেরস্থালি সামগ্রী, হাতিয়ার, গহনা, সিলমোহর, তাম্রলিপি ও শিলালিপি ইত্যাদি পাওয়া গেছে।

পাহাড়পুরের প্রত্নসম্পদের মধ্যে তাম্রশাসন ও শিলালিপি উল্লেখযোগ্য। বিহারের বারান্দার উত্তর-পূর্ব কোণে প্রাপ্ত ১৫৯ গুপ্তাব্দের (৪৭৯ খ্রি.) তাম্রশাসনটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত মূর্তির মধ্যে দন্ডায়মান বুদ্ধ, দন্ডায়মান উলঙ্গ জৈনমূর্তি, রাজাসনে উপবিষ্ট ব্রোঞ্জের কুবের ও গণেশমূর্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৩শ শতাব্দের শুরুতে ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির উত্তরবঙ্গ দখলের সময়ে পাহাড়পুর বিহার ধ্বংস হয় বলে মনে করা হয়। এর সাথে পৃষ্ঠপোষকতা ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবও দায়ী। এ সমৃদ্ধ সভ্যতাটির আবিষ্কার এতদঞ্চলের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। সবশেষে বলা যায় যে, পাহাড়পুরের সভ্যতাটি একাধারে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার নিদর্শন বহন করছে, যা বাংলার সমাজ-ইতিহাসের তাৎপর্যময় নিদর্শন হিসেবে বিবেচিত হয়।

পাহাড়পুরে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের গুরুত্ব: বাংলাদেশের প্রধান চারটি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে পাহাড়পুর অন্যতম। পাহাড়পুরে বৌদ্ধ ও হিন্দু সভ্যতার নিদর্শনসমূহের সমাজ-ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। পোড়ামাটির ফলক-চিত্রের রাজকীয় শিল্পবোধের বদলে লোকমানসের চরিত্র অধিক গুরুত্ব পেয়েছে। বাগদাদের খলিফা হারুন-অর-রশিদের একটি রৌপ্যমুদ্রা এ অঞ্চলের সাথে আরবের বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রমাণ দেয়। পাহাড়পুরের ছোট ছোট কুঠুরিসমূহ বৌদ্ধভিক্ষুদের বসবাসের দৃষ্টান্ত হাজির করে। পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত প্রত্নসম্পদগুলো সেসময়ের মানুষের শিল্পবোধ সম্পর্কে ধারণা দেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাহাড়পুরে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রীর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বৃহত্তর বাংলা জনপদের আলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের নাম পাহাড়পুর। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকাজের মাধ্যমে আবিষ্কৃত সোমপুর বিহার, সত্যপিরের ভিটা, স্নানঘাট, মন্দির প্রভৃতি তৎকালীন বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির পরিচায়ক। এখানে প্রাপ্ত অন্যান প্রত্নসামগ্রী থেকে তৎকালীন সমাজ জীবন এবং অর্থনীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ১৮০৭ এবং ১৮১২ সালে পূর্ব ভারতে প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করেন কে?

ক) স্যার আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম
খ) ব্রিটিশ নাগরিক বুকানন হ্যামিল্টন
গ) শরৎ কুমার রায়
ঘ) রাখাল দাস

২। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির বিকাশের আনুমানিক সময়কাল কত?

ক) ৫ম থেকে ৮ম খ্রি. পূ.
খ) ৭ম থেকে দ্বাদশ শতক
গ) ৯ম থেকে একাদশ শতক
ঘ) ১০ম থেকে পঞ্চদশ শতক

পাঠ-৩.৬ মহাস্থানগড়
Mahasthangarh

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- মহাস্থানগড়ের অবস্থান ও উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- মহাস্থানগড়ের প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	মহাস্থানগড়, প্রত্নসামগ্রী, গোবিন্দ ভিটা, বৈরাগীর ভিটা, খোদাইপাথর ভিটা, পরশুরামের প্রাসাদ, শীলাদেবীর ঘাট, লক্ষীন্দর মেধ।

বাংলাদেশের প্রাচীন সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন হচ্ছে মহাস্থানগড়। পাহাড়পুরের মত এখানেও বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। ধারণা করা হয়, বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের মধ্যে মহাস্থানগড়ই সর্বাধিক প্রাচীন।

অবস্থান: বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলোমিটার উত্তরে বাংলাদেশের প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ নগরী পুন্ড্রনগরের অবস্থান। ঢাকা-দিনাজপুর মহাসড়কের পাশে অবস্থিত এই পুন্ড্রনগরই হচ্ছে মহাস্থানগড়। এর পূর্বদিকে করতোয়া নদী প্রবাহিত। প্রাচীন এ সভ্যতাটি উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ১৫০০ মিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৪০০ মিটার বিস্তৃত।

উৎপত্তি: খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক দ্বিতীয় শতকে মহাস্থান ব্রাহ্মলিপিতে 'পুন্দনগল' এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা, এ পুন্দনগলই হচ্ছে প্রাচীন পুণ্ড্রের রাজধানী পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়। মৌর্য সম্রাট অশোকের একটি শিলালিপি ও চীনা পর্যটক হিউয়েন সাং- এর বর্ণনায় পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ আছে। হিউয়েন সাং- এর বর্ণনা থেকেই আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৭৯ সালে মহাস্থানকে পুণ্ড্রনগর বলে চিহ্নিত করেন। ১৯৩০ সালে ব্রাহ্মী অক্ষরে বাংলার প্রাচীনতম শিলালিপি থেকেও প্রমাণিত হয় যে, আজকের মহাস্থানগড়ই বাংলার প্রাচীনতম শহর 'পুণ্ড্রনগর'।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ থেকে তৃতীয় শতাব্দীতে পুণ্ড্রনগরে জৈনধর্ম প্রভাব ছিল বলে ধারণা করা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে 'পুণ্ড্র' হয়ে ওঠে 'পুণ্ড্রবর্ধন'। পুণ্ড্রবর্ধনের বিস্তৃতি ছিল বৃহত্তর বগুড়া, রাজশাহী ও দিনাজপুর জুড়ে। দশম শতকে এ অঞ্চল 'বরেন্দ্র' 'বরেন্দ্রী' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে বিভিন্ন শাসকবর্গ আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল। সামগ্রিকভাবে এখানে গড়ে ওঠে এক সমৃদ্ধ জনপদ। আর্যদের আগমনের আগে পুণ্ড্রনগরে 'পুণ্ড্র' নামের আদিবাসীরা বাস করত। বৌদ্ধসভ্যতার প্রাচীনতম ধ্বংসাবশেষ এই পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় মৌর্য, গুপ্ত, পাল ও বিভিন্ন হিন্দু সামন্তরাজাদের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল। প্রসিদ্ধতম মত হচ্ছে, পাল রাজাদের রাজত্বকালেই (৭৫০ খ্রি. থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) মহাস্থানগড় বা বরেন্দ্র সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছিল।

মহাস্থানগড়ের প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: প্রাচীরবেষ্টিত এ প্রাচীন নগরীর দৈর্ঘ্য ৫০০০ ফুট, প্রস্থ ৪৫০০ ফুট এবং চারপাশের সমতল ভূমি থেকে প্রায় ১৫ ফুট উঁচু। প্রাচীন নগরীটি দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তরে পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল বলে ধারণা করা হয়। পূর্বদিকে ছিল করোতোয়া নদী। মূল নগরীর বাইরে প্রায় ৫ মাইল পর্যন্ত শহরতলী ছিল। ১৯২৮-২৯ সালে কে.এন দীক্ষিতের তত্ত্বাবধানে ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এখানকার তিনটি ঢিবিতে খননকার্য পরিচালনা করে। এগুলো হচ্ছে বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা এবং মোনির ঘোন। ষাটের দশকের প্রথম দিকে এখানে আবার খননকার্য পরিচালনা করা হয়। তখন আবিষ্কৃত হয় পরশুরামের প্রাসদ, খোদাই পাথর ভিটা এবং মানকালীর কুণ্ড। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ক. বৈরাগীর ভিটা: বৈরাগীর ভিটা মূলত পাল আমলের দু'টি মন্দির। সমতল ভূমি থেকে ১০ ফুট উঁচুতে ৯২ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৮ মিটার প্রস্ত মন্দির দু'টি নকশদার ইট দ্বারা নির্মিত।

খ. *গোবিন্দ ভিটা:* মহাস্থানগড়ের দুর্গ প্রাচীরের বাইরে জাহাজঘাট থেকে ১৮৫ মিটার উত্তরে গোবিন্দ ভিটার অবস্থান। বস্তুত মহাস্থানগড়ের প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে এই গোবিন্দ ভিটা। এর বিরাট আকৃতি দেখে অনেকে ধারণা করেন, এখানে বৃহৎ আকারের প্রাচীন অট্টালিকা ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ থাকতে পারে। গোবিন্দ ভিটা বিষ্ণু মন্দির নামেও পরিচিত। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতকে এটি গড়ে তোলা হয়। গোবিন্দ ভিটা সংলগ্ন ৪৩ ফুট উঁচু ঢিবির উপর লক্ষিন্দরের মন্দির রয়েছে।

গ. *মোনির ঘোন:* দুর্গ প্রাচীরের বাইরে পূর্ব-দক্ষিণ দিকের ধ্বংসস্তুপকে মোনির ঘোন নামে অভিহিত করা হয়। এর উচ্চতা তিন মিটার, চওড়া ৩৩ মিটার এবং উত্তর-দক্ষিণে লম্বা ৩০ মিটার। নদীপথের উপর নজর রাখার জন্য পাল আমলে পর্যবেক্ষণ মঞ্চ হিসেবে এটি নির্মাণ করা হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়।

ঘ. *পরশুরামের প্রাসাদ:* মহাস্থানগড়ের সর্বশেষ হিন্দু রাজা পরশুরামের প্রাসাদের আয়তন ছিল ৬১ মিটার বাই ৩০ মিটার। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী থেকে ধারণা করা হয়, এটি ৮ম শতক বা তার পূর্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। এ প্রাসাদের সাথেই একটি সভাকক্ষ ছিল।

ঙ. *খোদাই পাথর ভিটা:* ৭.৩ বাই ৫ মিটার আয়তনের বৌদ্ধ মন্দিরটি ছিল পূর্বমুখী। এরমধ্যে ৩ মিটার বাই ২.৫ ফুট আয়তনের একটি পাথর পাওয়া গেছে। এ মন্দিরটি বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাব ও উৎকর্ষের সাক্ষ্য দেয়।

চ. *মানকালীর কুণ্ড:* খোদাই পাথর ভিটা থেকে একটু দূরে একটি প্রাচীন ধ্বংসস্তূপের (মানকালীর ভিটা) পাশে একটি গভীর শুষ্ক পুকুর (কুণ্ড) পাওয়া গেছে। জনশ্রুতি আছে, রাজা পরশুরামের মৃত সৈন্যদেরকে এই কূপের পানি পান করানো হলে তারা আবার জীবন ফিরে পেত।

ছ. *শীলাদেবীর ঘাট:* শীলাদেবী রাজা পরশুরামের পরমা সুন্দরী কন্যা মতান্তরে বোন ছিলেন। সুলতান বলখী মাহীসওয়ার রাজা পরশুরামকে পরাজিত করেন। নিজ সম্মান রক্ষায় শীলাদেবী নিজে করতোয়া নদীতে যে স্থানে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবিসর্জন দেন, তা শীলাদেবীর ঘাট নামে পরিচিত। এটি মহাস্থানগড় থেকে ১৮২ মিটার পূর্বে বৈরাগী ভিটার বিপরীতে অবস্থিত।

জ. *লক্ষীন্দর/গোকুল মেধ:* বগুড়া থেকে মহাস্থান যাওয়ার পথে গোকুল গ্রামে প্রায় ৪৩ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ঢিবির উপর অবস্থিত মন্দিরটি লক্ষীন্দর মেধ (মন্দির) নামে পরিচিত। লোককাহিনীর চরত্রি বেহুলা-লক্ষীন্দরের নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। গ্রামের নামানুসারে এটিকে গোকুল মেধ বলেও অভিহিত করা হয়।

ঝ. *মাজার ও মসজিদ এলাকা:* দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ১৭১৯ সালে নির্মিত এক-গম্বুজ-বিশিষ্ট একটি মসজিদ, সুলতান মাহীসওয়ার বল্‌খীর মাজার ও বেশ কয়েকটি কবর অবস্থিত।

মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত প্রত্নসামগ্রী: মহাস্থানগড়ে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের মাধ্যমে বহু প্রাচীন নিদর্শন বা প্রত্নসম্পদ পাওয়া গেছে। যার মধ্যে মধ্যে পাথরের বিষ্ণুমূর্তি, বিভিন্ন আকারের বোতাম ও গুটিকা, নানা রঙের মাটির পাত্র, থালা-বাসন, জলপাত্র, রান্নার হাড়ি-পাতিল, তামা ও ব্রোঞ্জের গহনা, সোনার অলংকার, আংটি ও বালা, পোড়ামাটির মূর্তি ও খেলনা, গোলাকার পোড়ামাটির সিল, মুদ্রা ও কড়ি, দোয়াত, প্রদ্বীপ, সিরামিক্স উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্থাপত্য শিল্প, প্রাচীরের গায়ের জ্যামিতিক নকশা, সিঁড়ি প্রভৃতি প্রাক-মোগল আমলের মুসলিম ঐতিহ্যের ইঙ্গিতবাহী। এখানে প্রাক-মোগল আমলের একটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ, আরবীয় সুফি-সাধক সুলতান মাহীসওয়ার বলখীর মাজার এবং মসজিদ রয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় মহাস্থানগড় জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির সংমিশ্রন।

মহাস্থানগড়ের প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের গুরুত্ব: প্রাচীন বাংলার তথ্য উদ্‌ঘাটনে মহাস্থানগড়ের প্রত্নসম্পদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ১৫ শতাব্দী পর্যন্ত এখানে একটি সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। এই সভ্যতায় বৌদ্ধ এবং হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাব ছিল। খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতকের পরে ক্ষুদ্র কক্ষবিশিষ্ট আবাসন নির্মাণপদ্ধতি প্রাচীন বাঙলার নিজস্ব স্থাপত্যকৌশলের প্রমাণ হাজির করে। বৌদ্ধধর্মের ওপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিজয় বার্তাকে ধারণ করে মহাস্থানগড়ের একটি মূর্তি নির্মিত হয়েছে। আবিষ্কৃত প্রস্তরমূর্তিগুলোতে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্মের প্রভাব প্রকট। আবার সুলতান বল্‌খী মাহীসওয়ারের মাজার মুসলিম আমলের নিদর্শন বহন করে। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাস অধ্যয়নের মহাস্থানগড়ের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহাস্থানগড়ের প্রধান স্থাপথ্যগুলোর বৈশিষ্ট্যসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতার নাম পুণ্ড্রনগর বা মহাস্থানগড়। এখানে জৈন, বৌদ্ধ, হিন্দু এবং সবশেষ মুসলিম সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে ১৫ শতক পর্যন্ত এখান সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশ অব্যাহত ছিল বলে ধারণা করা হয়। বৈরাগীর ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, পরশুরামের প্রসাদ, খোদাই পাথর ভিটা, শিলাদেবীর ঘাট, লক্ষীন্দর মেধ মোনির ঘোন প্রভৃতি এখানকার গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা নিদর্শন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মহাস্থানগড় কোথায় অবস্থিত?
   ক) কুমিল্লায় খ) ঢাকায়
   গ) বগুড়ায় ঘ) ঢাকায়

২। মহাস্থানগড় থেকে ১৮২ মিটার পূর্বে বৈরাগী ভিটার বিপরীতে অবস্থিত–
   ক) গোবিন্দ ভিটা খ) পরশুরাম প্রাসাদ
   গ) লক্ষীন্দর মেধ ঘ) শীলাদেবীর ঘাট

৩। মহাস্থানগড়ের পূর্ব নাম কী?
   ক) পুণ্ড্রনগর খ) সমতট
   গ) হরিকেল ঘ) কোনোটি নয়

৪। মহাস্থানগড়ের প্রধান স্থাপনা হচ্ছে–
   i. গোবিন্দ ভিটা
   ii. শালবন বিহার
   iii. শীলদেবীর ঘাট

সঠিক উত্তর কোনটি?
   ক) i. ও ii. খ) i. ও iii.
   গ) i, ii.ও iii. ঘ) ii.ও iii.

পাঠ-৩.৭ উয়ারি-বটেশ্বর
Wari-Bateshwar

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উয়ারি-বটেশ্বরের অবস্থান ও উৎপত্তি সম্পর্কে বলতে পারবেন;
- উয়ারি-বটেশ্বরে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনসমূহ এবং এর গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ	উয়ারি-বটেশ্বর, প্রত্নসামগ্রী, প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশন, টেরাকোটা, দুর্গনগর, বাণিজ্য নগর, গর্ত বসতি, অর্থনীতি, ধর্ম ইত্যাদি।

বাংলাদেশে সম্প্রতি আবিষ্কৃত এবং বহুলআলোচিত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বের এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতি দীর্ঘকাল মাটিচাপা পড়েছিল। উয়ারি-বটেশ্বর আবিষ্কারের পূর্বে বগুড়ার মহাস্থানগড়কে (পুণ্ড্রনগর) বাংলার সর্বাধিক প্রাচীন সভ্যতা বলে অভিহিত করা হতো। কিন্তু উয়ারি-বটেশ্বর সে ধারণায় চিড় ধরিয়েছে। নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের মতে, সমগ্র খনন কাজ শেষে গবেষণায় এটি প্রমাণিত হতে পারে যে, উয়ারি-বটেশ্বরই বাংলাদেশের প্রাচীনতম সভ্যতা।

অবস্থান: বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অদূরে নরসিংদী জেলার বেলাব ও শিবচর উপজেলার ৪ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে উয়ারি এবং বটেশ্বর গ্রামের অবস্থান। উয়ারি ও বটেশ্বর পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ভিন্ন গ্রাম হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দেশন হিসেবে একসাথে উচ্চারণ করা হয়। গ্রাম দু'টি আশে-পশের সমতল ভূমি থেকে একটু উঁচু। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র এবং আড়িয়াল খাঁ নদীর সঙ্গমস্থলের কাছে কয়রা নদীর দক্ষিণ তীরে উয়ারি এবং বটেশ্বর গ্রামের অবস্থান। সম্প্রতি আবিষ্কৃত হলেও এটি ইতোমধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থান হিসেবে আলোচিত হচ্ছে।

উৎপত্তি: নব্যপ্রস্তর যুগের পর থেকে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে নগর সভ্যতার গোড়াপত্তন হতে থাকে। মিশর, মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু সভ্যতা অনুরূপ নগর সভ্যতা হিসেবে স্বীকৃত। মহাস্থানগড় এবং উয়ারি-বটেশ্বর হচ্ছে এর পরবর্তী প্রজন্মের নগর সভ্যতা। খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দে একটি দুর্গ নগর হিসেবে উয়ারি-বটেশ্বরের আত্মপ্রকাশ ঘটে বলে ধারণা করা হয়। গ্রিকো-রোমান গণিতবিদ টলেমি (Claudius Ptolemy, ১০০-১৭০খ্রি.) তাঁর *Geographia* গ্রন্থে উয়ারি-বটেশ্বরকে 'সোনাগড়া' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি ভারত, শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডেও অনুরূপ কিছু প্রাচীন বাণিজ্যিক নগরীর উল্লেখ করেছেন। মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্গত এই জনপদে ২৫০০ বছর পূর্বে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির স্ফূরণ ঘটেছিল। কিন্তু এ সভ্যতা আধুনিক গ্রামীণ সভ্যতার নিচে চাপা পড়েছিল দীর্ঘকাল।

স্থানীয় স্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে এখানে প্রাচীনকালের কিছু মুদ্রা খুঁজে পান। হানিফ পাঠান এবং তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান উয়ারি-বটেশ্বর এলাকার গঠন, স্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রাচীন সামগ্রী অনুসন্ধান ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তারা বিষয়টি অনেকের নজরে আনেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে ২০০০ সাল থেকে এখানে খনন কাজ পরিচালিত হয়। আবিষ্কৃত হয় বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন নগর সভ্যতার।

উয়ারি-বটেশ্বরের প্রধান প্রধান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন: খনন কাজের মাধ্যমে প্রাপ্ত নিদর্শনসমূহের মধ্যে প্রাচীন দুর্গনগরী, বন্দর, রাস্তা, ঘরবাড়ি, টেরাকোটা, রৌপ্যমুদ্রা, হাতের কাজ করা ধাতব সামগ্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও গৃহকাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্য উল্লেখযোগ্য। উয়ারি-বটেশ্বর থেকে চার কিলোমিটার দূরে মন্দিরভিটা নামক একটি বৌদ্ধ মন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। অন্য আরেকটি গ্রামেও এরূপ আরেকটি বৌদ্ধ মন্দির পাওয়া গেছে। এ থেকে ধারণা করা যায়, এই জনপদে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিলো। পুরো জনপদে এখনো পর্যন্ত প্রায় পঞ্চাশটি প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্র পাওয়া গেছে, যার মধ্যে রঙেরটেক, সোনারুতলা, কেন্দুয়া, মরজাল, টঙ্গী রাজার বাড়ি, মন্দিরভিটা, চণ্ডীপাড়া, জয়মঙ্গল, কুণ্ডাপাড়া ও গোদাশিয়া উল্লেখযোগ্য।

খননকার্য পরিচালনাকারী অধ্যাপক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের মতে, উয়ারি-বটেশ্বর একটি পরিকল্পিত, সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন বাণিজ্যনগরী। আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে উয়ারি-বটেশ্বরের দুর্গনগরী ও প্রত্নসামগ্রী খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে উয়ারি-বটেশ্বরে ৬০০ মিটার করে দীর্ঘ চারটি মাটির দুর্গ-প্রাচীর আবিস্কৃত হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য দুর্গের চারদিকে পরিখার চিহ্ন বিদ্যমান। দুর্গের কাছাকাছি অসম রাজার গড় নামে ৫.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ আরেকটি মাটির বাঁধ রয়েছে। এসব প্রত্নতাত্ত্বিক ক্ষেত্রের অবস্থান থেকে ধারণা করা যায়, উয়ারি-বটেশ্বর ছিলো এক দূর্গনগর। আবার ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের দিক থেকেও উয়ারি-বটেশ্বর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলো। উয়ারি গ্রামে ১৬০ মিটার দীর্ঘ এবং ২৬ মিটার প্রশস্ত প্রাচীন পাকা রাস্তা বন্দর ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমের নিদর্শন বলে মনে করা হয়। এখানে উচ্চতাপমাত্রায় লোহা গলিয়ে কুঠারসহ বিভিন্ন যন্ত্রপাতি তৈরি করা হতো। এখানে কয়েক হাজার কুঠার পাওয়া গেছে। বন্দর ও বাণিজ্য নগরী হিসেবে এখানে বিভিন্ন কারখানা স্থাপিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। তামা, রূপা ও ব্রোঞ্জ গলিয়ে মুদ্রা প্রস্তত করা হতো। পাথর কেটে তারা মনোরম ও সুদৃশ্য পুঁতি তৈরি করতো। তারা বিভিন্ন রাসয়নিকের ব্যবহার জানতো।

বাংলাদেশে একমাত্র উয়ারি-বটেশ্বরেই 'গর্ত-বসতি'র সন্ধান পাওয়া গেছে। মাটিতে গর্ত করে বসবাসের উপযোগী 'ঘর' নির্মাণ করা হতো। মানব সভ্যতার 'তাম্রযুগে' এরূপ 'ঘর' নির্মাণ করা হতো। ভারত এবং পাকিস্তানেও এরূপ 'গর্ত-বসতি'র সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রত্নতাত্ত্বিকদের ধারণা, প্রায় ৪০০০ বছর আগে মানুষ এ ধরনের ঘরে বসবাস করতো। উয়ারি-বটেশ্বরের নিকটবর্তী গ্রামগুলোতে কৃষিকাজ বিস্তার লাভ করেছিল। এর পাশাপাশি ধনিক, বণিক, পুরোহিত, কারিগর, রাজকর্মচারী ও যোদ্ধারা নগরে বসবাস করতো। ধাতব সামগ্রী তৈরি করার মতো দক্ষ কারিগর সেখানে ছিলো। কৃষিজীবীরা অ-কৃষিজীবী পেশাজীবীদের জন্য খাদ্য-শস্যের যোগান দিত।

ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্তী হওয়ার কারণে উয়ারি-বটেশ্বরের সাথে তৎকালীন অন্যান্য জনপদের নৌপথে যোগাযোগ গড়ে ওঠা সহজ ছিল। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ এশিয়া প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর মতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের সাথে উয়ারি-বটেশ্বরের যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। নগরতত্ত্ববিদ গর্ডন চাইল্ডের মতে, ইটের ব্যবহার নগরায়নের প্রাথমিক শর্ত পূরণ করে। একইসাথে নদীর উপস্থিতি হেনরি পিরানির নগরসৃষ্টি তত্ত্ব সমর্থন করে। সার্বিক বিচারে উয়ারি-বটেশ্বরকে বাণিজ্য-নগরী বলেই অভিহিত করা যায়।

উয়ারি-বটেশ্বরের গুরুত্ব: বাংলাদেশের প্রাচীনতম নগর সভ্যতার নিদর্শন হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। এটি একাধারে প্রাচীন দুর্গনগরী এবং বাণিজ্য-নগরী হিসেবে স্বীকৃত। কৃষির পাশাপাশি এখানে নদীকেন্দ্রিক যোগাযোগ, জীবিকা নির্বাহ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং বন্দরভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো। মুদ্রা অর্থনীতি ও কৃষি বহির্ভুত পেশার চর্চা উয়ারি-বটেশ্বরের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইটের ব্যবহার, পাকা রাস্তা, প্রাচীর ও পরিখা উন্নত নগর সভ্যতার পরিচায়ক।

বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার বিকাশ হয়েছে পনের শতকের পর। কিন্তু আজ থেকে প্রায় আড়াই হাজার বছর পূর্বে ঢাকার অদূরে ব্রহ্মপুত্রের তীরে গড়ে উঠেছিল এক বিশাল বন্দর ও বাণিজ্য নগরী। দুর্গ ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত নিরাপত্ত ব্যবস্থা থেকেই এ নগরীর সমৃদ্ধি ও গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

বাংলার ইতিহাস চর্চা হতো আর্যদের আগমন এবং মৌর্য, পাল ও সেন সেনযুগ থেকে। আদিবাসী বলতে অনগ্রসর কোল-ভিল-সাঁওতাল জনগোষ্ঠীকে বুঝানো হতো। কিন্তু উয়ারি-বটেশ্বর বাংলার সমাজ-ইতিহাসকে নতুন করে লিখতে বাধ্য করছে। এ জনপদে প্রাচীন সভ্যতার স্ফূরণ ঘটেছিল উয়ারি-বটেশ্বর থেকে আমরা সে প্রমাণই পাই।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাণিজ্যিক নগরী হিসেবে উয়ারি-বটেশ্বরের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করুন। **সময় : ৫ মিনিট**

সারসংক্ষেপ

সম্প্রতি আবিষ্কৃত বাংলাদেশের এক প্রাচীন নগর সভ্যতা হচ্ছে উয়ারি-বটেশ্বর। প্রাচীন এ দুর্গনগরী বাণিজ্যিকভাবে অনেক সমৃদ্ধ ছিল। বাণিজ্যের পাশাপাশি এখানে কৃষি কাজেরও বিস্তার ঘটেছিল। এখানে বৌদ্ধ সংস্কৃতি উৎকর্ষ লাভ করেছিল বলে ধারণা করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। টলেমির *Geographia* গ্রন্থে ‘সোনাগড়া’ বলে যে স্থানের উল্লেখ করেছেন তা মূলত–

ক) ময়নামতি খ) পাহাড়পুর
গ) মহাস্থানগড় ঘ) উয়ারি-বটেশ্বর

২। উয়ারি-বটেশ্বর কোন সাম্রাজ্যের আমলে বিকশিত হয়?

ক) মৌর্যযুগে খ) পাল আমলে
গ) সেন আমলে ঘ) মোগল আমলে

৩। উয়ারি-বটেশ্বরে ৬০০ × ৬০০ মিটার আয়তনের কয়টি মাটির দুর্গ-প্রাচীর আবিস্কৃত হয়েছে।?

ক) চারটি খ) পাঁচটি
গ) ছয়টি ঘ) সাতটি

উত্তরমালা :

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১	ঃ	১। ক	২। ঘ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩	ঃ	১। খ	২। গ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪	ঃ	১। ঘ	২। খ	৩। গ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫	ঃ	১। খ	২। খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬	ঃ	১। গ	২। ঘ	৩। ক	৪। খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭	ঃ	১। ঘ	২। ক	৩। ক		
চূড়ান্ত মূল্যায়ন	ঃ	১। গ	২। ক	৩। খ	৪। ঘ	৫। গ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

১। ভারতীয় উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার কোনটি?

(ক) শালবন বিহার (খ) আনন্দ বিহার

(গ) সোমপুর বিহার (ঘ) কোনোটিই নয়

২। প্রস্তরযুগের প্রধানত কয়টি স্তর (ধরন) রয়েছে?

(ক) তিনটি (খ) চারটি

(গ) পাঁচটি (ঘ) ছয়টি

খ. বহুপদি সমাপ্তিসূচক বহুনির্বচনী প্রশ্ন

৩। বাংলার প্রাচীনতম প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হচ্ছে–

(i) ময়নামতি-পাহাড়পুর

(ii) মহাস্থানগড়-উয়ারি-বটেশ্বর

(iii) উয়ারি-বটেশ্বর- পাহাড়পুর

সঠিক উত্তর কোনটি?

(ক) i (খ) ii

(গ) i ও ii (ঘ) ii ও iii

গ. নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

স্থানীয় স্কুল শিক্ষক জনাব মোহাম্মদ হানিফ পাঠান ১৯৩৩ সালে এখানে প্রাচীনকালের কিছু মুদ্রা খুঁজে পান। হানিফ পাঠান এবং তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠান তাদের এলাকার গঠন, স্থাপনা এবং বিভিন্ন প্রাচীন সামগ্রী অনুসন্ধান ও সংগ্রহে আত্মনিয়োগ করেন। পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির মাধ্যমে তারা বিষয়টি অনেকের নজরে আনেন।

৪। উদ্দীপকে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের কথা বলা হয়েছে?

(ক) ময়নামতি (খ) পাহাড়পুর

(গ) মহাস্থানগড় (ঘ) উয়ারি-বটেশ্বর

৫। উয়ারি-বটেশ্বর আনুমানিক কত বছর পূর্বের প্রাচীন নিদর্শন?

(ক) ১৫০০ বছর (খ) ২০০০ বছর

(গ) ২৫০০ বছর (ঘ) ৩০০০ বছর

ঘ) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন:

উদ্দীপকটি পড়ুন এব নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

এসএসসি পরীক্ষা শেষে উজ্জ্বল ও তার বন্ধুরা একদিন বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনা করলো। উজ্জ্বলের বড় বোন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জ্যোতির পরামর্শে তারা ময়নামতি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল। সেখানে সারাদিন ঘুরে তারা শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, কোটিলামুড়া, চারপত্র মুড়া, রূপবান মুড়া সবকিছু ভালোভাবে দেখল। প্রাচীন বিভিন্ন স্থাপত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন দেখে উজ্জ্বল ও তার বন্ধুরা হতবাক। ইতিহাসের ছাত্রী জ্যোতি যখন তাদেরকে এগুলো সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিল তখন তারা আরো অভিভূত হয়েছিল।

১) ময়নামতি কোথায় অবস্থিত? ১

২) ময়নামতির গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো কি কি? ২

৩) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রত্নস্থানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৩

৪) প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বর্তমান সমাজ ও সভ্যতা কীভাবে উপকৃত হতে পারে? ব্যাখ্যা কর। ৪